তারিখ ... 20 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

কালের কণ্ঠ

পড়ালেখা কোচিংয়ে সার্টিফিকেট স্কুলে!

- স্কুলে যথাযথভাবে না পড়ানোর অভিযোগ
- স্কুল-কলেজ ঘিরে অলিগলিতে কোচিং সেন্টার
- শিক্ষকরা একাধিক কোচিংয়ে জড়িত শিক্ষার্থীদের সেগুলোতে পড়তে বাধ্য করার অভিযোগ
- বাড়তি ক্লাসের নামে কৌশলে স্কুলেও চলে কোচিং

শরীফুল আলম সুমন ▷

কাক-ভোরে মেয়েকে নিয়ে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন বিলকিস বেগম। মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রভাতী শাখায় নবম শ্রেণিতে পড়ে তাঁর মেয়ে। ক্লাস চলেছে সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। স্কুল শেষেই শুরু কোচিং, ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত। মেয়েকে মিরপুর ১০ নম্বরে প্যারাগন কোচিং সেন্টারে দিয়ে বাইরে এসে নিচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। জানালেন, কোচিং শেষে মেয়েকে নিয়ে বাসায় ফিরতে ফিরতে বেলা গড়িয়ে যাবে। সন্ধ্যায় আবার মেয়েকে পড়াতে বাসায় আসবেন প্রাইভেট শিক্ষক।

স্কুলের বাইরে কোচিং-প্রাইভেটে কেন এত সময় দিতে হয়—এমন প্রশ্নের

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ১

পড়ালেখা কোচিংয়ে সার্টিফিকেট স্কুলে!

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

জবাবে বিলকিস বেগম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'স্কুলে তো শুধু পড়া দেয়। এর বাইরে তো তাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। এখন এই পড়া তৈরি করতে হলে তো কোচিং-প্রাইভেটের কাছে যেতেই হবে। কোচিংয়ে তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগে, তবে তারা স্কুলের চেয়ে ভালো পড়ায়। কিন্তু সার্টিফিকেট পেতে হলে তো স্কুলে যেতেই হবে। তাই যাওয়া।'

কথার মাঝখানে আরো কয়েকজন অভিভাবক এসে যোগ দিলেন। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বেইলি রোড শাখার ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী মুনতাকা বিনতে বশিরকে নিয়ে এসেছিলেন তার মা শাহিদা ইসলাম। মুনতাকা তখন প্যারগন-লাগোয়া আরেক কোচিং সেন্টার বর্ণমালায় ক্লাস করছিল।

শাহিদা ইসলাম বলেন, 'স্কুলে পড়ায়, কিন্তু যতটুকু দরকার ততটুকু পাওয়া যায় না। তাই আমাদের বাধ্য হয়েই কোচিংয়ে আসতে হয়। এখন যদি বলি কোচিং করাব না, তাহলে তো আমার মেয়ে পিছনে পড়ে যাবে।'

শিরীন আক্তার নামের আরেক অভিভাবক বললেন, 'স্কুলে হয়তো একটি অঙ্ক করিয়ে দিল। তারপর বলে দিল, ওটা দেখে পুরো চ্যাপ্টারের অঙ্ক করতে হবে। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? স্কুলে অঙ্ক, ইংরেজি, বিজ্ঞানের জন্য যদি বেশি সময় বরাদ্দ থাকত আর শিক্ষকরা প্রতিটি নিয়মের জন্য একেকটি অঙ্ক বুঝিয়ে দিতেন তাহলে তো আর আমাদের কোচিংয়ে আসতে হতো না। আবার পরে যদি বাচ্চারা কোনো বিষয়ে সমস্যায় পড়ে তখন স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে তেমন কোনো সাহায্যও পাওয়া যায় না।'

প্যারাগন ও বর্ণমালার থেকে অল্প দূরত্বে চারুপাঠ একাডেমিক কোচিং। মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ওই কোচিংয়ে নিয়ে এসেছিলেন তার বাবা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই এলাকায় প্রায় ৩০টি কোচিং সেন্টার আছে, যেগুলোর বেশির ভাগের সঙ্গেই স্কুলের শিক্ষকরা জড়িত। ক্লাসে কিছুই পড়ান না শিক্ষকরা। বলে দেন, তাঁর কোচিং সেন্টারে যেতে। একেবারে ওপেন ক্লাসেই বলেন। না গেলে ক্লাসে বকাঝকা করেন, পরীক্ষায় নম্বর কম দেন। তাই তো মাসে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে এই কোচিংয়ে পড়াতে হচ্ছে।'

অভিভাবকদের কথার সূত্র ধরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল অনেক স্কুলের শিক্ষকরা নামে-বেনামে কোচিং সেন্টারগুলোর সঙ্গে জড়িত। শুধু মিরপুর ১০ নম্বরের আইডিয়াল গার্লস ল্যাবরেটরি স্কুলের পাশের দুই গলিতে ২৭টি একাডেমিক কোচিং সেন্টারের খোঁজ পাওয়া গেল। সেগুলো হচ্ছে এসএম অ্যান্ড নেট একাডেমি, প্যারাগন কোচিং, রং একাডেমিক কোচিং, কমার্স কোচিং, সায়েন্স কোচিং, অঙ্কন একাডেমিক কোচিং, চারুপাঠ কোচিং, এডুকেশন একাডেমি কেয়ার, মবিডিক কোচিং, ম্যাথস ওয়ার্ল্ড, আরগো কোচিং, গুরুকুল কোচিং, কমার্স একাডেমি, ধর্ণমালা কোচিং, অরবিট কোচিং, বর্ণ একাডেমিক কোচিং, নিউরন কোচিং সেন্টার, আরবান কোচিং, ই হক কোচিং সেন্টার, রেডিয়াস একাডেমিক কোচিং, নাহিদ প্রাইভেট কেয়ার ও ইউরেকা একাডেমিক কেয়ার।

অভিভাবকদের জানান, মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষকরা এ এলাকার কোচিং সেন্টারগুলোর সঙ্গে জড়িত। ওই স্কুলের শিক্ষক আবদুস সালাম এসএম অ্যান্ড নেট একাডেমির সঙ্গে জড়িত। প্যারাগন কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িত একই স্কুলের শিক্ষক সাজেদা বেগম, সেলিম রেজা এবং আরেক স্কুলের শিক্ষক কমলা রানী দাস। সেলিম রেজা নিজের বাসায়ও শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ান। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত স্কুল সময়ের বাইরে বেশির ভাগ সময়ই তিনি দেন প্রাইভেটে। মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরির শিক্ষক আবদুল হান্নান জড়িত এডুকেশন একাডেমিক কেয়ারে। আরেক শিক্ষক আবদুল জলিলও কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত।

তবে আবদুল হান্নান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একসময় আমার মালিকানায় এডুকেশন একাডেমিক কেয়ার নামে একটি কোচিং সেন্টার ছিল। কিন্তু এটা এখন আরেকজনকে দিয়ে দিয়েছি।' শিক্ষকরা কেন কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িত—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বর্তমানে আমরা যে বেতন পাই তাতে শিক্ষকদের প্রাইভেট-কোচিং করানোর প্রয়োজন হয় না। ডাল-ভাত খেয়ে বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা ক্লাসে মন দেয় না। মোবাইল-ইন্টারনেটে ব্যস্ত থাকে। এমনকি পর্নোগ্রাফিতেও আসক্ত থাকে। একটি ক্লাসে ৭০ থেকে ৮০ জন শিক্ষার্থী থাকে। ফলে শিক্ষকও সমানভাবে সবার দিকে নজর দিতে পারেন না। আবার কেউ পড়া না করলে যে শাস্তি দেব সে উপায়ও নেই। ফলে শিক্ষার্থীরাই প্রাইভেট-কোচিংয়ের দ্বারস্থ হয়।'

মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ওমসান গণি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানের পাশে বেশ কিছু কোচিং সেন্টার আছে। সেখানে আমাদের শিক্ষকরাও জড়িত থাকতে পারে। আমি বিষয়টি গভর্নিং বডির মিটিংয়ে তুলেছিলাম। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সরকারি নীতিমালার বাইরে কেউ কোচিং-প্রাইভেট করাতে পারবে না। বিষয়টি আমি শিক্ষকদের জানিয়ে দেব। কেউ না মানলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, রাজধানীর প্রায় প্রতিটি নামি-দামি স্কুল-কলেজ ঘিরেই গড়ে উঠেছে কোচিং-অঞ্চল। মিরপুরের মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে রয়েছে প্রায় ১৫টি কোচিং সেন্টার, ধানমণ্ডির গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের পাশের গলিতেও রয়েছে প্রায় ১৫টি কোচিং সেন্টার। রাজধানীর ফার্মগেট, মতিঝিল, শাহজাহানপুর, এলিফ্যান্ট রোড, সিদ্ধেশ্বরীসহ বিভিন্ন এলাকায়ও গড়ে উঠেছে কোচিং-অঞ্চল।

স্কুলেও বাধ্যতামূলক কোচিং : কোচিং নীতিমালার দোহাই দিয়ে স্কুলগুলোও বাধ্যতামূলকভাবে আয়োজন করছে কোচিংয়ের। প্রায় সব স্কুলেই অতিরিক্ত ক্লাসের নামে কোচিং করানো হচ্ছে। কোনো শিক্ষার্থী কোচিং করতে রাজি হোক বা না হোক, তাকে নির্দিষ্ট ফি দিতেই হবে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও কোচিং করানোর অনুরোধসংবলিত আবেদনও জমা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। কোনো অভিভাবক আবেদন জমা না দিলে তাঁর সন্তানকে হয়রানি করার অভিযোগ রয়েছে।

গত মার্চে রাজধানীর গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলও একপ্রকার জোর করে অভিভাবকদের অমতে আবেদন জমা নেয়। মাসিক ফি নির্ধারণ করা হয় এক হাজার ২০০ টাকা। গত মে মাসে এর বাইরেও নেওয়া হয় মডেল টেস্ট। সেখানেও একই পরিমাণ ফি নির্ধারণ করা হয়। চলতি মাসে ফের মডেল নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে।

একজন অভিভাবক নাম প্রকাশ না করে বলেন, "কয়েক দিন আগেই মডেল টেস্ট হলো। আবারও মডেল টেস্ট নেওয়ার কথা বলা হলে আমরা প্রধান শিক্ষকের কাছে যাই। তখন তিনি বলেন, 'আপনারাই তো কোচিং করানোর জন্য আবেদন করেছেন।' অথচ বাস্তবে আমাদের কাছ থেকে জোর করে আবেদন নেওয়া হচ্ছে। আবেদন না দিলে বাচ্চাকে হয়রানি করবে, এই ভয়ে দিয়েছি। এমনকি যে মডেল টেস্ট নিয়েছে সেখানে সবাইকে উদারহস্তে নম্বর দিয়েছে। ৯০-এর নিচে পেয়েছে এমন ছাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ আমার বিশ্বাস, আমার সন্তান এই পরীক্ষা দিয়ে ৯০ পেতে পারে না। একই কায়দায় আবার মডেল টেস্ট নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।'

অভিযোগ রয়েছে, রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি স্কুল, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিলসহ প্রায় সব স্কুলেই এভাবে অতিরিক্ত ক্লাসের নামে শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

কোচিং বন্ধে নীতিমালা : কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকার ২০১২ সালে একটি নীতিমালা প্রকাশ করেছে। সেখানে একজন শিক্ষককে তাঁর প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ১০ জন শিক্ষার্থীকে পড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে শুধু অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানপ্রধান অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে মহানগর এলাকায় মাসে ৩০০ টাকা, জেলা শহরে ২০০ টাকা এবং উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১৫০ টাকা করে রসিদের মাধ্যমে নেওয়া যাবে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানপ্রধান স্ববিবেচনায় এ হার কমাতে বা মওকুফ করতে পারবেন। একটি বিষয়ে মাসে সর্বনিম্ন ১২টি ক্লাস হতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারবে। এই টাকা প্রতিষ্ঠানপ্রধানের নিয়ন্ত্রণে একটি আলাদা তহবিলে জমা থাকবে। প্রতিষ্ঠানের পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সহায়ক কর্মচারীর ব্যয় বাবদ ১০ শতাংশ টাকা কেটে রেখে বাকি টাকা অতিরিক্ত ক্লাসে নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়ায় কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা অনুসরণ না করলে একজন শিক্ষককে দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড ও ছয় মাসের কারাদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনিটরিং কমিটিও গঠন করেছে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ে ইউএনওরা কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন।

গত ১৫ জুন জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একজন সংসদ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'কোচিং নীতিমালা ২০১২ বাস্তবায়নের জন্য দেশের মেট্রোপলিটন, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটি কাজ করছে। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে কোচিং বাণিজ্যে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যেসব শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন তাঁদের বদলি-পদায়নের কার্যক্রম চালু রয়েছে।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের সদ্য বিদায়ী মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধে বর্তমানে যে নীতিমালা আছে তা সংশোধন করা দরকার। আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসগুলোও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের কাছে নীতিমালা লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ আসে তা আমরা খতিয়ে দেখি। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেই।'